বিপ্লবের ইতিহাস

অক্টোবর বিপ্লব ও বিশ শতকের উত্থানপতন

নাজমুল সুলতান

বিপুলা বিশ শতকের উত্তাল যৌবন শুরু হয় অক্টোবর বিপ্লবের অকস্মাৎ ঝাঁকিতে। উনিশ শতকের লেনাদেনা মিটানোর যুদ্ধ তথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফাঁকতালে টালমাটাল রুশদেশে ঘটল মোটামুটি রক্তপাতহীন এক বিপ্লব। আঠারো শতকের প্রান্তরে যেমন ফরাসি বিপ্লব সব ছাড়িয়ে এক পায়ে দণ্ডায়মান, বিশ শতকের অক্টোবর বিপ্লবের ক্ষেত্রে এমনটা বলা যায় না। বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মহাকাশজয়, পারমাণবিক বোমা ইত্যাদির ভিড়ে বিশ শতক ঘটনা জর্জর। বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়াও এই বিশ শতকীয় ইতিহাসের কর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিপ্লবের রুশদেশীয় আবির্ভাব গণঅভ্যুত্থান আর সোভিয়েতের (তথা শ্রমিক ও সৈনিকদের রাজনৈতিক সমিতি) সূত্রে হলেও শেষটা হয়েছিল আমলাতন্ত্রের রাজনীতিবিরূপ মৃত্যু-উপত্যকায়। এইসব ধ্বংসলীলা আর অতিমানবীয় উল্লম্ফনের সহচর হয়েও বিশ শতকে অক্টোবর বিপ্লবের স্থান বিশেষ। চীনা বিপ্লব থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বের গুচ্ছ গুচ্ছ স্বাধীনতা বিপ্লব– অক্টোবর বিপ্লবের কাছে সবারই দেনা অপরিমেয়। তাই এত এত বিপ্লবের পরেও বিশ শতকের যৌবন থেকে বার্ধক্য অবধি অক্টোবর বিপ্লব আর বিপ্লব যারপরনাই সমার্থক ছিল। রাজনৈতিক ভবিষ্যতের যে ছবি এই বিপ্লবের সূত্রে নির্দিষ্ট হয় তার প্রভাব নেহাত কার্যকারণের নিরিখে অনুধাবন করা যাবে না। আরেক শতাব্দীর পাদদেশে বসে অক্টোবর বিপ্লবের পুনর্বিবেচনা করার লগ্নে তাই বিপ্লব ধারণার ইতিহাস দিয়ে শুরু করাই সমীচীন।

১

ইংরেজি রেভোল্যুশন শব্দের পরিভাষা হিসাবে একদা বাংলায় চালু করা বিপ্লব এখন আপন ইতিহাসে ঋদ্ধ এক শব্দ। রেভোল্যুশনের বরাতে আমাদের আর বিপ্লবের অর্থ বুঝতে হয় না। গেল শতকে বাংলা ভাষায় ও ভাবে বিপ্লব নামক ধারণা আত্তীকৃত হয়ে গেছে। তবে আজকাল আমরা রেভোল্যুশন বলতে যা বুঝি তার সাথে শব্দটির সম্পর্ক খুব পুরানো নয়। রিভল্‌ভ বা ঘূর্ণন থেকে রেভোল্যুশন শব্দের উৎপত্তি। মধ্যযুগে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই শব্দের ব্যবহার ছিল না। প্রথম নথিবদ্ধ ব্যবহার পাওয়া যায় সতের শতকে। বলাই বাহুল্য, তখনও রেভোল্যুশন তার আধুনিক অর্থ ঠিক ধারণ করে উঠেনি। সতের শতকের শেষাশেষি ইংল্যান্ডে গ্লোরিয়াস রেভোল্যুশনের কালে শব্দখানার ব্যবহার আরও বাড়তে থাকে। তবে রাজত্বের উচ্ছেদ নয় বরং তার পুনর্বহাল অর্থকে ব্যঞ্জিত করার জন্যই রেভোল্যুশন শব্দের ব্যবহার চলছিল। রাজক্ষমতার খর্বকারী ঘটনা হিসাবে ইতিহাসে গ্লোরিয়াস বিপ্লব পরিচিত থাকলেও তা রাজতন্ত্রকে বাতিল করে দেয়নি– স্টুয়ার্ট মনার্কিকে উচ্ছেদ করে তা উইলিয়াম এবং মেরিকে রাজত্বের সীমিত মসনদে পুনঃরাসীন করে। রেভোল্যুশন শব্দের এই ব্যবহার জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে রেভোল্যুশনের মূল রিভল্‌ভ বা ঘূর্ণন এখনো অক্ষত; গ্রহতারার নিয়মিত ঘূর্ণন বোঝাতে রেভোল্যুশন শব্দের ব্যবহার বিদিত হয়। পাঠক জেনে থাকবেন নিকোলাস কোপার্নিকাসের মধ্যযুগ-কাঁপানো জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের নাম ছিল *De revolutionibus orbium coelestium*। তাই উইলিয়াম আর মেরি রাজত্বের পুনর্বহাল জ্ঞাত করার জন্য রেভোল্যুশন শব্দের ব্যবহার অত্যাশ্চর্য ছিল না। রিজিম বা শাসন ব্যবস্থার ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার ধারণা পশ্চিমা চিন্তায় সেই গ্রীকযুগ থেকেই বিদ্যমান। প্লেটোর রিপাবলিক এর সর্বজনবিদিত উদাহরণ।

আধুনিক যুগের জ্ঞানে বিপ্লবের প্রধানতম অর্থ সম্ভবত তার ছেদধর্ম। রাজনৈতিক অর্থে, বিপ্লব বলতে আমরা যেকোন শাসনব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর বুঝে থাকি। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনী প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের ভিত্তি নতুন করে নির্মাণ না করলে কোন ঘটনাকে বিপ্লব সহজে বলা হয়ে থাকে না। প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ভিতরে কোন শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তাকে বিপ্লব বলা বাহুল্য হয়, তেমনি কেবল আইনবহির্ভূত ক্ষমতাদখলকেও (যথা সামরিক অভ্যুত্থান) বিপ্লব অভিধায় সম্মানিত করা হয় না। পশ্চিমা ভাবজগতে বিপ্লবভাবের সূচনা হয় ফরাসি বিপ্লবের সূত্রে। চক্রাকার ঘূর্ণনভাবের যতি টেনে আঠারো শতকের ফরাসি বিপ্লবীরা তাদের বিপ্লবকে নতুন জমানার উদ্বোধন আকারে তত্ত্বায়িত করা শুরু করেন। এই নয়া সমাজ পত্তনের সাথে তাই কালিক পরম্পরার গূঢ়

সম্পর্ক। ফরাসি বিপ্লবে এর সবচেয়ে নাটকীয় নজির সম্ভবত ছিল পুরাতন বর্ষপঞ্জি প্রত্যাখ্যান করে নতুন বিপ্লবকেন্দ্রিক বর্ষপঞ্জি গ্রহণ করার উদ্যোগে। অতলান্তিকের ওপারে মার্কিন বিপ্লবীরা "novus ordo seclorum" (যুগের নতুন বিন্যাস) স্লোগানে আত্মপরিচয় স্থিত করেছিলেন। তবে শুধু ছেদধর্ম দিয়ে বিপ্লবধারণাকে পুরোপুরি ধরা যাবে না। আঠারো শতকের পশ্চিমা বিপ্লবগুলো নয়া জমানার উদ্বোধনের সাথে সাম্য আর স্বাধীনতার সম্ভাবনার গাঁটছড়া বাঁধে। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক বিন্যাসের সাথে মৌলিক ছেদ ঘটিয়ে নাগরিকদের বিপ্লবজাত সাম্যে স্বাধীনতাকে স্থাপন করার উচ্চাশা ঘোষণার মধ্যেই তো ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব। এই ঘোষণার প্রতিধ্বনি উনিশ শতকের রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনে বারবার বেজে উঠেছে। ঠিক, সাম্য এবং স্বাধীনতাকে একসূত্রে মিলানোর প্রথম পরীক্ষণ ফরাসি দেশে শেষমেশ রক্তবন্যায় পর্যবসিত হয়েছিল। আধুনিক রক্ষণশীলতার আদিসূত্রও এই সাম্য-স্বাধীনতা মেলানোর ফরাসি ইতিহাসের সাথে যুক্ত (যেমন জোসেফ দো মেস্ত্র)। অবিপ্লবী কিন্তু সংবেদনশীল ফরাসি রাজনীতিতাত্ত্বিক আলেক্সি দো টক্‌ভিলের পাঠকেরা জানবেন বিপ্লবজাত রাজনৈতিক সাম্যের জোরে গভীরতর সামাজিক অসাম্য খারিজ করা কী দুরূহ প্রক্রিয়া। উনিশ শতক সেই গুরু কর্মকেই তাত্ত্বিকভাবে সম্পাদনের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

২

বিপ্লব ধারণার জন্ম খোলাসা করতে গেলে এই নয়া জমানার ভাব আমাদের খানিকটা খনন করতে হবে। আপাতত সংক্ষেপে। এই ভাবের ঠিকুজি কয়েক শতক আগে পর্যন্ত টেনে নেয়া গেলেও মূল সংঘটন ঘটে আঠারো শতকের ইয়ুরোপে। ইতিহাসের সাথে কালিকবিন্যাসের সম্পর্ক এই যুগে নতুন করে রচিত হয়। আধুনিক ইতিহাসবোধকে অনেকেই সরলরৈখিক সময়ের সাথে একীভূত করে দেখেন যা খানিকটা দিকভ্রষ্টকারী। ঐতিহাসিকভাবে ইয়ুরোপে খ্রিস্টীয় মতবাদের উপহার ছিল সরলরৈখিক সময়জ্ঞান। আদম-হাওয়ার সূচনাবিন্দু থেকে জগতসিন্ধু হয়ে কেয়ামতের সমাপ্তিলীলা। এই পাটাতনে ভবিষ্যতবোধের চূড়ান্ত পরিণতি কেয়ামত। তা একদিকে যেমন ঋষি অগাস্টিনের দুনিয়াবিমুখ দর্শন সম্ভব করে তুলেছিল তেমনি বিস্তারিত করেছিল বহুবিধ মিলেনারিয়ান বা কেয়ামতপূর্ববর্তী ঈশ্বর-রাজত্ব।

আঠারো শতকের ইয়ুরোপে সময়বোধের ভিতরে নতুন একধরণের পর্যায়করণ ঘটে। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ– এই ত্রিকালেভেদ দানা বাঁধে। সেই বুনিয়াদি সময়ে আধুনিকতা বলে যা চাউর করা হল তার মূলশাঁস, জার্মান ইতিহাসতাত্ত্বিক রাইনহার্ট কোজেলেকের ভাষায়ঃ যা আসলেই নতুন, যা আগে কখনো ছিল না, যা আগে কখনো সম্ভব ছিল না (কোজেলেক ২০০২, ১৫৪-১৬৯)। এই নবযুগ জ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল মুক্ত ভবিষ্যতজ্ঞান। এই ভবিষ্যতপট সফেদ বলেই তাতে লেখা সম্ভব সাম্য-স্বাধীনতার অভিনব দলিল। ফরাসি বিপ্লবের পরে পরে বিপ্লব ধারণার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে গেল এই নয়া জমানা পত্তনের প্রত্যাশা। আঠারো শতকের অভিজ্ঞতা ছেঁকে নিয়ে বলা যায়ঃ নবযুগ পত্তনের ভাবরসের সাথে সাম্য-স্বাধীনতার ধারণা পর্যবসিত করার মাঝেই আধুনিক যুগের বিপ্লব ধারণার বিশেষত্ব (দেখুন, আরেন্ট ১৯৬৩)।

আঠারো শতকের ফ্রান্সে বিশেষ ধরনের ইতিহাস লেখার চর্চা ছিল যাকে conjectural বা আন্দাজি ধারার ইতিহাস বলে অভিহিত করা যায়। মানবসমাজের বিবর্তনের ইতিহাস এই কাহিনীধারায় সাম্য-স্বাধীনতার শূন্যবিন্দু থেকে রাজতন্ত্রের দাসত্বে পর্যবসিত হয়। বিপ্লবের নয়া জমানা প্রতিশ্রুতির এই ভারটা তবে কোথা থেকে আসলো? এই বোধের জন্য আমাদের আঠারো ও উনিশ শতকে পরিবর্তনশীল ইতিহাসধারণার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। রুসো, সিয়েস প্রমুখ রাজনৈতিক দার্শনিকেরা মানবেতিহাসকে ক্রমশই সাম্য-স্বাধীনতা লোপকরণ প্রক্রিয়ার সাথে একীভূত করে তত্ত্বায়িত করেন। রুসো যেমন সভ্যতার বিকাশের সাথে পরাধীনতা ও বৈষম্যের গাঁটছড়া বাঁধেন। তবু আধুনিক মানুষ যেহেতু সভ্যতারই ঔরসজাত সেহেতু আদিম যুগে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নাই। রূপান্তরটা প্রথমত ঘটানো দরকার রাজনৈতিক সংঘটনের জায়গায়– জনগণের সার্বভৌমত্ব দ্বারা রাজতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বকে প্রতিস্থাপিত করার মধ্য দিয়ে। সভ্যতার যাত্রাপথে লোপ পাওয়া সাম্য আর স্বাধীনতাকে নতুন সমাজপত্তনের চুক্তি দ্বারা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজনীতির এই নব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ক্রমে হয়ে দাঁড়ালো নবযুগের উদ্বোধন– ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক মৌলিক ছেদ।

ফরাসি বিপ্লবের ভাবে জার্মান চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। বৃদ্ধ কান্ট থেকে যুবক হেগেল– জার্মান ভাবুকেরা সদলবলে ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক মর্ম বোঝাপড়ায় শামিল হন। উনিশ শতকের

জার্মানিতে, মূলত হেগেলের হাত ধরে, ঐতিহাসিকতাবাদ নামে এক নতুন তাত্ত্বিক অবয়ব নির্মিত হয়। এই ঐতিহাসিকতাবাদের বিশেষত্ব হচ্ছে মানবেতিহাসের নানা বাঁককে- ভালো ও মন্দ- ক্রমপ্রাগ্রসর এক যাত্রার অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা। দ্বন্দ্ব আর উত্থান-পতনের যোগফল যে প্রাগ্রসরতা আর ক্রমমুক্তি তা এই যুগের চিন্তাজগতে পোক্ত হয়ে বসে। এখানে বলে রাখা দরকার যে হেগেলের ঐতিহাসিকতাবাদ মোটের উপর পশ্চাদমুখী ছিল, অর্থাৎ বিদ্যমান যুগের অন্তর্গত বিপ্লবকেই তিনি ঐতিহাসিক সময়ের যাত্রাপথের ক্রমপরিণতি আকারে তত্ত্বায়িত করেন। তরুণ হেগেলপন্থীদের মিশ্র প্রচেষ্টার পর সেই ঐতিহাসিকতাবাদ নাটকীয়ভাবে ভবিষ্যতের দিকে মুখটি ফেরায়। মার্ক্সবাদের উত্থান ঘটে এমন এক প্রেক্ষিতে। মার্ক্স তার রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র আর ঐতিহাসিকতাবাদ একসূত্রে মিলাতে পেরেছিলেন বলেই ইতিহাস, সাম্য আর স্বাধীনতা বিপ্লব চিহ্নে লীন হয়ে যায়। মার্ক্সবাদের রাজনৈতিক সমীকরণ দাঁড়ায় এই– বিপ্লব মানে নয়া জমানার আগমন, আর নয়া জমানা মানে শ্রেণীহীন সাম্য-স্বাধীনতা। উনিশ শতকের শেষাশেষি মার্ক্সবাদ ইয়ুরোপজুড়ে ছোঁয়াচে ভাবের মত ছড়াতে থাকে– কারখানায় এবং ক্যাফেতে। শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্যমান আন্দোলনকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা উনিশ শতকের মার্ক্সবাদকে নিজস্ব চরিত্র দেয়। সেই বিপ্লব মাঝে মাঝে হাতছানি দিলেও তত্ত্বের মঞ্জিলেই তার সত্যিকারের সিংহাসন তৈরি হয়। রুশদেশে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই মার্ক্সবাদ ক্রমেই ছড়াতে থাকে– যদিও তা ছিল একাধারে ইয়ুরোপ এবং বিপ্লবের প্রান্তিক জনপদ।

৩

আঠারো শতকে বিপ্লব-ধারণার সমান্তরালে গড়ে উঠে আরেকটা জ্ঞানকাণ্ড, আজকাল আমরা যাকে বলি পলিটিকাল ইকোনোমি বা রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র। রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের বরাতে জন্ম নেয় নতুন এক বিমূর্ত সত্তা, সোসাইটি বা সমাজ। প্রাচীন গ্রীক, এমনকি রেনেসাঁস রাজনৈতিক চিন্তার সাথে যারা পরিচিত তারা জানেন যে সমাজ বলে আলাদা কোন সত্তা শাসনপদ্ধতি কিংবা ইনসাফের দার্শনিক আলোচনায় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিল না। বুনিয়াদি রাজনৈতিক চিন্তকদের ভিতরে প্রথম সমাজ-ভাবের কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় জন লকের লেখাজোখায়। এর সাথে উদীয়মান পুঁজিবাদের যোগসাজশ যে ছিল তা বলাই বাহুল্য। সমাজ-ধারণার অর্থ মোটের উপর তৈরি হয় এই অনুমান থেকেঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজের নিয়মে চলে, ফলত রাষ্ট্র এবং তার আইনী সত্তার ক্ষমতা জোর করে তা পাল্টাতে পারবে না। সমাজ, এই নয়া অর্থে, অর্থশাস্ত্রের চারণক্ষেত্র।

কার্ল মার্ক্স পশ্চিমা ইতিহাসের পয়লা রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদ ছিলেন না। এই শাস্ত্রের আদি কারিগরেরা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ করে (আধুনিক অর্থে) বামপন্থী ছিলেন এমনও না। তবে সমাজ, তথা অর্থশাস্ত্রের চারণক্ষেত্র, যে রাষ্ট্রের পুরোপুরি অধীনস্থ না সেই ব্যাপারে তাদের একধরনের ঐকমত্য ছিল। আঠারো শতকের আগে রাজনৈতিক দর্শন কদাচ "সমাজ" নামক সত্তাকে আপন প্রকল্পের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা হিসাবে দেখেনি। সমাজ-আবিষ্কারের পরে পরেই কিন্তু পশ্চিমা, বিশেষত ইংল্যান্ডের, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রীরা সমাজ রূপান্তরের পানে ধাবিত হননি। প্রথম দিককার চিন্তাভাবনা বরঞ্চ অনেকাংশেই সমাজকে তার অন্তর্গত দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার দিকে মনোযোগী ছিল। তবে চিন্তাজগতের গভীরতর পরিবর্তনটা ঘটছিল অন্যত্র। একদা রাষ্ট্র-দর্শনের নিকট সমাজ কোন সীমাবদ্ধতার নাম ছিল না (তার মানে এই না যে আদি রাজনৈতিক দর্শন কোন বাধা মোকাবেলা করে নাই– যেমন "মানবপ্রকৃতি" আদি-আধুনিক রাজনৈতিক দার্শনিকদের কাছে সীমাবদ্ধতার নাম ছিল; তার নিয়ম মেনেই রাজনীতিকে তত্ত্বায়িত করার চেষ্টা হব্‌স কিংবা লক করেছিলেন)। কিন্তু এখন ঘটলো তার উল্টো ব্যাপার। সমাজের গভীরতর ব্যাধি এবং সম্ভাবনার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রাজনীতির এককালীন সার্বভৌমত্ব খারিজ হয়ে গেল। সমাজের নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রাজনীতিকে এগোতে হবে। উদারবাদীরা রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মর্জিমত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাজাতে চেয়েছিলেন ঠিক এই কারণে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে তাই রাজনীতির জমিন সঙ্কুচিত হতে থাকল। বিপ্লব-পরবর্তী সেই দুরাশাময় কালের জ্ঞান বেঞ্জামিন কন্‌স্তান্ত একবাক্যে ছেঁকে এনে বলেছিলেনঃ বাণিজ্যের যুগ আধুনিক যুগে রাজনীতির কাজ কেবল ব্যবস্থাপনা; প্রাচীন যুগের অফুরন্ত অবসরে রাজনীতির যে বৈভব ছিল এ যুগে তা হবার নয়।

এ যাত্রায় মার্ক্স সাহেবের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ভিতরের তলাটে প্রবেশ করবার ফুরসত হবে না। পূর্বসুরীদের ছাড়িয়ে মার্ক্স রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রকে নবায়ন করেন তা বলাই বাহুল্য। মার্ক্স-কর্তৃক তত্ত্বায়িত শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব (এবং সন্নিহিত উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব) অর্থশাস্ত্রের "প্রাকৃতিক নিয়ম"কে যে মৌলিকভাবে রূপান্তরিত করে তা ওয়াকিবহাল

পাঠকের জানা আছে। রাজনৈতিক বিভেদের মূলসূত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কে স্থাপন করার মধ্য দিয়ে মার্ক্স পূর্বসুরীদের থেকে নিজেকে আরেকটু আলাদা করেন। সমাজের নিয়ম যে রাজনীতি থেকে আসে না তা মার্ক্সের আবিষ্কার না, কিন্তু তাদের সম্পর্ককে একটানে উল্টে দেওয়াটা মার্ক্সের বিশেষ কীর্তি। যে জায়গায় মার্ক্সের অবদান একান্তই মৌলিক তা হল অর্থশাস্ত্র তথা সমাজের নিয়মকে অপরিবর্তনীয় (বা আপন ইচ্ছার অধীন) না ধরে নিয়ে তাদেরকে ইতিহাসের যন্ত্রে বিচার করা। এই হিসাবে, বিলাতি রাজনৈতিক শাস্ত্রের মঞ্জিলের মিনারটা শেষপর্যন্ত জার্মানই। মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মর্ম তাই দাঁড়াল এইঃ ইতিহাসকে– যার মূলস্রোত সমাজ তথা অর্থশাস্ত্রের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়- "মুক্তির" বন্দরে পৌছানো মানে নব-আবিষ্কৃত সমাজ (তথা পুঁজির নিয়মকে অতিক্রম করা)। জার্মান ইতিহাস দর্শনের সাথে বিলাতি অর্থশাস্ত্র মিলিয়ে মার্ক্স এসে ভিড়লেন ফরাসি বন্দরে।

৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে যে মার্ক্সবাদী রাজনীতি ইয়ুরোপে দানা বাঁধলো তার আকার-সাকার গঠিত হয় রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র আর প্রগতিশীল ইতিহাসতত্ত্বের যৌথ ছাঁচে। দাস ক্যাপিটালে মার্ক্স কতটুকু ইতিহাসদর্শনে নিমজ্জিত ছিলেন সেটা তর্ক সাপেক্ষ, কিন্তু মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক সংঘটনে ইতিহাস দর্শনের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। মার্ক্সের অর্থশাস্ত্র এক তরফা নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ পুঁজি-মুনাফা-উদ্বৃত্ত মূল্যের সংঘটন কীভাবে হয় তা বোঝাপড়ার জন্য পুঁজিবাদের অন্তর্গঠন আর ইতিহাস যথেষ্ঠ। পুঁজিবাদের অন্তর্গত সংকট-মন্দা ইত্যাদি আধুনিক অর্থনীতিবিদের কায়দায়ও পাঠ করা যায়। তবে মার্ক্সের এমন পাঠ কঙ্কালসর্বস্ব। কেননা মার্ক্সের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের রাজনীতিও কলকাঠি নাড়ছিল। এই জন্য আমাদের প্রলেতারিয়েত তথা সর্বহারা ক্যাটাগরিটা আমলে আনতে হবে। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে সমাজের একটা আবশ্যিক পরিবর্তন হয়। উনিশ শতকের ভোঁতা ভাষায় যে সম্পর্ককে বেস (ভিত্তি) ও সুপারস্ট্রাকচারের (উপরিকাঠামো) আদলে ব্যাখ্যা করা হত। পুঁজিবাদ একদিকে সমাজকে রূপান্তরিত করে, সামন্তবাদের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পাল্টে জন্ম দেয় আইনী সাম্য। দাসত্বের বদলে বাজারের নিয়মে ঠিক হয় শ্রমের মজুরি। সমাজের এই কাঠামোগত পরিবর্তনের রাজনৈতিক নাম খুঁজতে গিয়ে মার্ক্সবাদীরা একদা এই প্রক্রিয়াকে বলতেন বুর্জোয়া বিপ্লব।

উনিশ শতকের মার্ক্সবাদে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ ইতিহাসতত্ত্বের ব্যাকরণে রাজনৈতিক অর্থ ধারণ করে। রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাসতত্ত্বের অধীনঃ রাজনীতির সময় (পুঁজিবাদের সংকটকাল), রাজনীতির কর্তা (শ্রমিক শ্রেণী), রাজনীতির গন্তব্য (সমাজতন্ত্র), রাজনীতির স্থান (অগ্রসরমান পুঁজিবাদ)। রাজনীতি এই নিরিখে ইতিহাসের অনিবার্যতার, ইতিহাসের প্রয়োজনের, খবর কান পেতে শুনে সম্পাদন করবার চর্চা। ইতিহাসতত্ত্বের এই নির্দিষ্টতাবাদী ধারণার সন্ধান অনেকেই করে থাকেন স্বয়ং কার্ল মার্কসের ১৮৫৯-এর "রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনায় অবদান" নামক গ্রন্থে। মার্ক্স উৎপাদন পদ্ধতির কয়েকটি স্তর চিহ্নিত করেন– এশীয়, প্রাচীন, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ আর অনাগত সমাজতন্ত্র (পরবর্তীতে মার্ক্স অবশ্য এশীয় উৎপাদন পদ্ধতিকে আলাদা প্রকরণ হিশাবে দেখা বাদ দিয়েছিলেন)। এই বিচারে দেখা গেল যে উৎপাদন পদ্ধতি আপন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ক্রমে এক স্তর পার হয়ে আরেক স্তরের দিকে অগ্রসরমান। মামলাটা তাহলে এক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে আরেক উৎপাদন পদ্ধতিতে গমনের বা উত্তরণের ব্যাপার। বলাই বাহুল্য, এই মামলার মীমাংসার উপর রাজনীতির প্রশ্ন নির্ভরশীল।

মার্ক্সের উৎপাদন পদ্ধতি তত্ত্বের প্রথম সূত্র হচ্ছে উৎপাদন শক্তির প্রাথমিকতার সূত্র তথা উৎপাদন শক্তি বরাবর উৎপাদন সম্পর্ক এবং অবশিষ্ট উপাদান সমূহের উপর ছড়ি ঘোরায়। উৎপাদন পদ্ধতির অ-সাংঘর্ষিক সময়ে উৎপাদন শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিকতা মিলমিশের হয়, অর্থাৎ একে অন্যের প্রয়োজন মেটায়। গোলটা বাঁধে উৎপাদন শক্তি আর সম্পর্কের সংঘাতের সময়ে। তবে তার আগে ভাবা দরকার সংঘাতের সময়কালটা কি জিনিস? উৎপাদন সম্পর্ক যখন উৎপাদিকা শক্তির শরীরে শিকলরূপে জারি থাকে কেবল তখনই এক উৎপাদন পদ্ধতির স্তর থেকে আরেক স্তরে গমনের প্রয়োজন হাজির হয়। ধরা যাক, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যখন পুঁজিবাদের বিকাশ হচ্ছে। আর যখন উৎপাদন সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিকতার শিকল দিয়ে পুঁজির বিকাশে বাঁধা দেয়, তখন বাড়ন্ত বুর্জোয়ারা উৎপাদন শক্তির জোরে সামন্তব্যবস্থাকে বিলীন করে পুঁজিবাদের বিকাশের দরজা খোলে দেয়। পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে এই ইতিহাসতত্ত্ব প্রয়োগ করলে যা দাঁড়ায়ঃ পুঁজিবাদের অন্তর্গত সংকটের কালে রূপান্তরের তথা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের সময়, আর সেই রূপান্তর ঘটনার– যাকে আমরা বলি বিপ্লব– কর্তা হবে শ্রমিকশ্রেণী। কারণ শ্রমিকশ্রেণী পুঁজির গর্ভ থেকেই তার কবর রচনা করবে। এই কারণেই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে গেওর্গে লুকাচ বলেছিলেন একই সাথে ইতিহাসের বিষয় ও বিষয়ী।

৫

ইতিহাসতত্ত্ব আর রাজনীতির এই আপাত সরল সম্পর্কের সমীকরণ তাত্ত্বিক সংকটে পর্যবসিত হয় অর্ধবিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, বিশেষত রাশিয়ায়। রাশিয়ায় পুঁজিবাদ পশ্চিম ইয়ুরোপের মতো বিকশিত হয়নি তা মানতে কারো আপত্তি ছিল না। আর এই অর্ধবিকশিত পুঁজিবাদ আর রাজনৈতিক ক্ষমতার সামন্ততান্ত্রিক বিন্যাসের কারণে আশু বিপ্লবের বুর্জোয়া চরিত্র কবুল করা নিয়েও বিশেষ বিভেদ ছিল না। রাশিয়া যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তৈরি না হয়, তবে অনাগত বিপ্লব, গোঁড়া মার্ক্সবাদীদের বিচারে, কেবল বুর্জোয়া চরিত্রেরই হবে না, বুর্জোয়ারা সেখানে নেতৃত্বও দিবে বটে। অর্থাৎ বিপ্লবের কর্তা হবে বুর্জোয়া শ্রেণী। ঠিক এই কারণেই আন্তোনিয়ো গ্রামশি *দাস ক্যাপিটাল*কে রাশিয়ায় বুর্জোয়াদের কিতাব বলে একদা ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই লৌহকঠিন ইতিহাসতত্ত্বের অনিবার্যতার বলি হল রাজনীতি; রাজনীতির কাজ যেন ইতিহাসের আপন গন্তব্যে বিশ্বাস রেখে সে পথে নিজেকে বিসর্জন দেওয়া। পুঁজিবাদী নিরিখে পশ্চাদপদ দেশকালকে সরলরৈখিক ইতিহাসের রায় মানতে হবে কি না তা নিয়ে স্বয়ং মার্ক্স অবশ্য দোদুল্যমান ছিলেন। ১৮৮১ সনে, রুশ মার্ক্সবাদী ভেরা জাসুলিচকে লেখা চিঠি তার সাক্ষীঃ "রাশিয়ায় কিছু বিশেষ পরিস্থিতির অনন্য সমন্বয়ের সুবাদে, গ্রামীণ কৌমসমাজ ক্রমে প্রাক-পুঁজিবাদী প্রাচীন উপাদানসমূহ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে সরাসরি জাতীয় পর্যায়ে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে রাশিয়ার সমকালীনতার সুবাদে তা পুঁজিবাদের ভালো দিকগুলো, পুঁজিবাদ বিকাশের ভয়ঙ্কর যাত্রাপথকে পাশ কাটিয়ে, আত্মস্থ করতে পারবে" (মার্ক্স ১৮৮১)। মার্ক্সের অনুমানে রাশিয়ার পুঁজিবাদ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর একটা উপায় হচ্ছে কৃষিকে কৌম আর যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়া। একই সময়ে, রুশ দেশে পুঁজির প্রসার আর সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেনীর বিকাশের সাথে সাথে রাজনীতির গুরুপ্রশ্ন কৃষক শ্রেণী আর শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সম্পর্ক কী হবে তাতে দাঁড়াল। কৃষক শ্রেণীর প্রশ্ন রুশ মার্ক্সবাদে বরাবরই মূল প্রশ্নগুলোর একটা ছিল।

বলশেভিক আর মেনশেভিকদের বিভাজনের মূলে বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে তর্কাতর্কির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সময়ে শ্রেণীসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়েও বিবাদ জারি ছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী গোঁড়া মার্ক্সবাদের অনুসরণে মেনশেভিকেরা দাবি করতেন রুশ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব হবে, আর সেই বিপ্লবে সামন্তশক্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমর্থন করাটা হবে যথার্থ বৈপ্লবিক দায়িত্ব। কৃষকশ্রেণীর প্রশ্ন এই সমীকরণে মুখ্য নয়। বলশেভিকেরা, অন্যদিকে, বিপ্লবের বুর্জোয়া ঐতিহাসিকতা স্বীকার করে নিলেও রাজনৈতিক কর্তাসত্তা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিতে নারাজ ছিলেন। ফলত তারা শ্রমিক-কৃষকের "গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিকতার" পক্ষে দাঁড়ালেও সেই ক্ষমতাবণ্টন কী রূপে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ তৈরি করবে তা নিয়ে দ্ব্যর্থবোধকতা রয়ে গেল।

৬

"অক্টোবর বিপ্লব কার্ল মার্ক্সের দাস ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে বিপ্লব। রাশিয়ায় মার্কসের ক্যাপিটাল যতোটা না ছিল সর্বহারার কিতাব তার চেয়েও তা বেশি ছিল বুর্জোয়াদের। কেননা রাশিয়ার উদাহরণ ধরে দেখানোর দরকার ছিল যে সেখানে সর্বহারার নিজের দাবি পেশ করবার আগে, বিপ্লব করবার আগে, বুর্জোয়াদের বাড়তে হবে, সেখানে একটা বুর্জোয়াযুগ বিকশিত হতে হবে, সেখানে পশ্চিম ইয়ুরোপের ঢঙ্গে একটা অগ্রসর পুঁজিবাদ দাঁড়াতে হবে। কিন্তু ঘটনা ভাবাদর্শের শিকল ভেঙ্গে উত্তরণ করল। যেইসব তত্ত্ব দাবি করতো রাশিয়ায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্র অনুসরণ করে পুঁজিবাদের বিকাশ হতে হবে, অক্টোবর বিপ্লব নামের ঘটনা সেইসব তত্ত্বাবাজির অসারতা দেখিয়ে দিল বলশেভিকেরা তাদের কর্মযোগে, তাদের অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেল যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, যেমন অনেকে ভেবে থাকেন বা এককালে ভেবে ছিলেন, জগদ্দল পাথরের ন্যায় স্থাণু নয়" (গ্রামশি ১৯৯৪, ৩৯-৪০)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের তাত্ত্বিক পাটাতনের ভিতরে থেকে কাজ করছিলেন। পুঁজিবাদীদের নেতৃত্বে বিপ্লবে তাঁর আস্থা না থাকলেও সহি বিপ্লবের নামে ক্ষমতাদখলের প্রকল্প দানা বেধে ওঠেনি

তখনও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক কর্তব্য নিয়ে কাউট্স্কিপন্থীদের সাথে লেনিনের বিচ্ছেদ হয়। ১৯১৭ সালের গোড়ায় ঘটে যাওয়া ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কারো নেতৃত্বে হয়নি। লেনিন এবং মোটাদাগে বলশেভিক নেতৃত্ব তখন নির্বাসনে। সেই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় রাজতন্ত্র খারিজ হয়ে গেল, কিন্তু শূন্য ক্ষমতাকেন্দ্রে দাবি বসানোর মতো কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি হাজির ছিল না। কেরেন্স্কির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকার সেই টালমাটাল অবস্থার নিয়ন্ত্রণ বিশেষ নিতে পারেনি।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটে যাবার পর আদি মার্ক্সবাদী তত্ত্বের উপর ভর করে রুশদেশের রাজনৈতিক সংকট অনায়াসে ব্যাখ্যা করা একাধারে বর্তমানবিমুখ ও অনর্থক হয়ে দাঁড়ালো। রাশিয়ার ক্ষমতার দরজা তখন খোলা, পাহারাহীন। কম্যুনিস্টদের সিংহভাগ তবুও ক্ষমতা দখলে আগ্রহী না, কেননা পুঁজিবাদ-অবিকশিত রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তো অনুপস্থিত বুর্জোয়া শ্রেণীর! নির্বাসন থেকে এর মধ্যে লেনিন ফিরলেন। দলছুট ত্রৎস্কিও বলশেভিক বলয়ে ক্রমেই চলে আসছিলেন। লেনিনের উপর বর্তালো এক গুরুদায়িত্বঃ ইতিহাসের সময়ের শিকল ভেঙ্গে রাশিয়াকে রাজনীতির সময়ে স্থিত করা। এই পথ সহজ ছিল না। এপ্রিল থিসিস বলশেভিক পার্টিতে পেশ করার পর তা মেনে নিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বেশির ভাগ সদস্যেরই আপত্তি ছিল। কীভাবে লেনিন সেই সংকটাক্রান্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিজের এবং বলশেভিকদের কর্তৃত্ব জারি করলেন তা এখানে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ হবে না। তবে এটুকু বলা যায় যে লেনিনের এই কৃতিত্ব ইতিহাস আর রাজনীতির সম্পর্ককে একই সূত্রে ব্যাখ্যার প্রকল্পকে কার্যত বাতিল করে দিল। হল আদি মার্ক্সবাদের অবসান।

ইতিহাসতত্ত্বের ব্যবস্থাপত্রের বিরুদ্ধে অক্টোবর বিপ্লবকে যেতে হলেও বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মৌলিকভাবে মার্ক্সবাদী। সাম্য ও স্বাধীনতার অনন্ত ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠিত করার প্রকল্প। সেই প্রকল্পে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ইতিহাসতত্ত্বের সমস্যা। রাশিয়া যেহেতু পুঁজিবাদ কিংবা ইতিহাসের নিরিখে অনগ্রসর সেহেতু বিপ্লবী রাষ্ট্র একাধারে দুই গুরুদায়িত্ব আপন ঘাড়ে চাপিয়ে নিলো। রাশিয়ায় উৎপাদন শক্তিকে যেমন ইতিহাসের সময়ের (তথা উন্নত পশ্চিমা ইয়ুরোপীয়) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে তেমনি সাম্য ও স্বাধীনতার সম্মিলনও ঘটাতে হবে। এই দুই বিপরীতধর্মী উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে গিয়ে বলশেভিক পার্টি বিপ্লবের পর থেকেই নানা সমস্যা জর্জরিত হতে থাকে। তার উপর ভূ-রাজনৈতিক চাপ আর প্রলম্বিত গৃহযুদ্ধ। লেনিনের মৃত্যুর পর ত্রৎস্কির নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব আর স্তালিনের একদেশে সমাজতন্ত্রের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ তৈরি হয়। তাদের দ্বন্দ্ব কেবল এই দুই অভিমুখ দেখে বোঝা দায়। রুশদেশীয় মার্ক্সবাদীর মধ্যে ত্রৎস্কি সম্ভবত ইতিহাসতত্ত্বে সর্বাপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, যদিও লেনিনের রাজনীতিপটুতা তাঁর মধ্যে ছিল না। ত্রৎস্কি এক অর্থে ইতিহাসের দরজা খোলা রেখে (তথা পশ্চিমা ইয়ুরোপে বিপ্লবের অপেক্ষা অব্যাহত রেখে) সীমিত পরিসরে কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে রাশিয়ায় সমাজ রূপান্তরের কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন। ত্রৎস্কি ইতিহাসের উপর আস্থা রেখে কতদূর এগোতে পারতেন তা বলা মুশকিল। স্তালিনের প্রকল্প অন্যদিকে সাম্য-স্বাধীনতার বিমূর্ত প্রকল্পকে অবজ্ঞা করে রাশিয়াকে প্রথমত ঐতিহাসিক সময়ের যানে তোলা। আমলাতান্ত্রিক যুদ্ধে জয়ী হলো দ্বিতীয়পক্ষ। তার পরের কাহিনী সকলের কমবেশি জানা। ইতিহাসতত্ত্বের দায় সারতে গিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া হয়ে দাঁড়ালো আপাদমস্তক রাজনীতিবিমুখ। বিশ শতকের শেষাংশে সোভিয়েত রাশিয়ার দেহাবসান হল বৈকি– তবে বিপ্লবের তিরোধান ১৯৩০-এর দশকেই হয়ে যায়।

৭

বিশ শতকের পরম্পরায় অক্টোবর বিপ্লবের অবস্থান তাই দ্বন্দ্বমুখর। একদিকে তা নয়া জমানার প্রতিশ্রুতিকে ইতিহাসতত্ত্বের কবল থেকে মুক্ত করে। সাম্য-স্বাধীনতার জন্য ইতিহাসের কী স্তরে কার অবস্থান এই প্রশ্ন অক্টোবর বিপ্লবের পর বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায়। চীনা বিপ্লব কিংবা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিরেখায় অক্টোবর বিপ্লবের ছাপ গভীর। বিশ শতকে বিপ্লবের যে প্রাচুর্য তার মূলসূত্র নিহিত অক্টোবরে। কিন্তু বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়ায় যা ঘটল তার প্রভাবও ছিল সর্বব্যাপী। ইতিহাস কিংবা দাস ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে স্তালিনযুগে রাশিয়া সেই ইতিহাসতত্ত্বের লৌহশৃঙ্খলে নিজেকে পুনর্বার আবদ্ধ করে নেয়। রক্তপাত ও সহিংসতার কথা না বললে চলে। রাষ্ট্র ধারণারই এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে সেই সময়েঃ ঐতিহাসিক পশ্চাৎপদতা অতিক্রান্ত করার কাণ্ডারী হওয়া হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব। তার মানে হল অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত রূপান্তরের ছক এঁকে তার বাস্তবায়ন করা। আর তা করতে গিয়ে শুধু উদারবাদী আইনের শাসন নয়– গণতন্ত্রকেও ইতিহাসের নামে মুলতবি রেখে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি

হল। এই সমীকরণের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় উত্তর-ঔপনিবেশিক তৃতীয়বিশ্বের রাষ্ট্রচিন্তায়ঃ নেহরু বা সুকুর্ণ বা শেখ মুজিব সজ্ঞান মার্ক্সবাদী না হলেও সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রদর্শন তাদের প্রকল্পকে ঐতিহাসিকভাবে সম্ভব করে তোলে।

বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ ঘটনা (কিংবা প্রতিঘটনা) ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার পতন। তবে সেই পতন কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ছিল না– একই সাথে শেষ হয় সোভিয়েত-অনুপ্রাণিত (তৃতীয়বিশ্বের) উন্নয়নবাদী এবং (পশ্চিমের) কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগড়ার প্রকল্প। নাটকীয়ভাবে একে ইতিহাসের শেষবিন্দু বলা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক বেহুদা কথা একদা হয়েছে। ইতিহাসের না হলেও তা বিংশ শতাব্দীর যবনিকাপাত ছিল নিঃসন্দেহে। একবিংশ শতাব্দীতে উদারবাদী গণতন্ত্র পশ্চিমে ভিতর থেকে ধসে পড়ছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বে না আছে উদারবাদী গণতন্ত্রের ভগ্নাবশেষ, না আছে ইতিহাসজয়ের বিগত প্রত্যাশা। বর্তমানের এই সংকট জন্মলাভ করেছে সদ্য বিলুপ্ত ভবিষ্যতের (তথা বিশ শতকের) ধ্বংসস্তূপ থেকে। সাম্য-স্বাধীনতা রাজনৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড হিসাবে এইযুগের ভিতরে ক্রিয়াশীল, কিন্তু যে সফেদ ভবিষ্যতপটে একদা নবযুগ রচনা করার প্রত্যাশা ছিল তা আর অবশিষ্ট নেই। এই অনির্দিষ্ট পারাবারে দোদুল্যমান থেকেই, তাকে অস্বীকার করে নয়, অক্টোবর বিপ্লবকে স্মরণ করতে হবে।

গ্রন্থসূত্রঃ

Arendt, Hannah. 1963. *On Revolution*. Chicago: University of Chicago Press.
Gramsci, Antonio. 1994. *Pre-Prison Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
Koselleck, Reinhart. 2002. *The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts*. Stanford: Stanford University Press.
Marx, Karl. 1881. *Letter to Vera Zasulich*: *The First Draft*.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/zasulich/draft-1.htm